দৈনিক সংবাদ
03 JAN 1987

তথ্য ও পরি... ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

01

আমাদের শিক্ষা নিয়ে

[illegible] হক

স্কুল-কলেজের শিক্ষা জীবনে আমার কাছে সবচাইতে ভীতিজনক ছিল অতিরিক্ত মাত্রায় নানা পাঠ্যপুস্তকের চাপ। যে সব বিষয়ে আমার কোন উৎসাহ ছিল না এবং যে বিষয়গুলোকে মনে হতো জীবনের পক্ষে অনাবশ্যক, সেই বিষয়গুলোকেই দিনের পর দিন কন্ঠস্থ করে শিক্ষকদের প্রশ্নের জবাব দিতে হতো এবং পরীক্ষার খাতার লিপিচাতুর্যের দ্বারা প্রমোশন অর্জন করতে হতো। আর বুক-লিষ্টের পুস্তক সংখ্যাও কি দু'-এক খানি? নিম্নক্লাসে কমপক্ষে এক ডজন, উর্ধ্ব ক্লাসে ততোধিক। বিস্তৃত পাঠ্য তালিকাও ছিল তেমনি লক্ষ্য করার মতো। কোনো ছাত্রের পক্ষে সে এক ভয়াবহ ব্যাপার। পরে অবশ্য পাঠ্যপুস্তকের পাঠ অতিক্রম করে মনে করেছি--পুরো বিষয়গুলো না হলেও বহু অত্যাবশ্যকীয় বিষয় যদি নিয়মানুবর্তিতার ভিত্তিতে ছাত্রের ওপর চাপ সৃষ্টি করে পড়ানো না হয়, তবে বোধকরি বিশ্ব সংসারের কোনো বালকই স্বেচ্ছায় বিদ্যার্থী হয়ে বিদ্যামন্দিরমুখী হবে না; বরং ততক্ষণে কোনো দেবমন্দিরের বহির্দ্বারে দাঁড়িয়ে সোৎসাহে কাঁসর-ধ্বনি করতে বা মসজিদের নামাজ নিমিত্তে হেদায়েত করতে অথবা মুক্ত প্রান্তরে সারাদিন ড্যাংগুলি খেলে কোন প্রতিযোগীকে হারিয়ে দিতে অধিক উৎসাহ বোধ করবে। কিন্তু যে ভাবনা থেকে সেদিন সেই অধিকসংখ্যক পাঠ্য পুস্তকের সঙ্গে আমার রুচি মেলাতে পারিনি, আজ উত্তর পৌঢ়ত্বের কাছাকাছি এসেও কিন্তু আমি সেই ভাবনা থেকে মুক্ত নই। ইংরেজ আমলে আমাদের প্রথম জীবনে পাঠ্য তালিকার যে বহর ছিল, উত্তর-স্বাধীনতাকালে আমাদের স্বরাজক্ষেত্রে সে বহর আরও চতুর্গুণ বেড়েছে। এখন ইংরেজের শিক্ষাবিধিকে নিন্দা করে আমাদের শিক্ষাবিদরা নিজেদের পাণ্ডিত্য জাহির করতে যে শিক্ষাক্রম চালু করেছেন, তা আরও ভয়াবহ। ইংরেজ আমলের পাসকরা কোন চৌকস-যিনি আজ অভিভাবকত্ব অর্জন করেছেন, তাঁকেও এখন নিজের সন্তানকে কোনো পাঠ বুঝিয়ে দিতে ঘর্মাক্ত কলেবরে পশ্চাদপসরণ করতে হয়। বারবার তাই শিক্ষা কমিশন বসছে, বারবার শিক্ষা-বিল ওঠছে, বারবার তাই পাঠ্য তালিকা পরিবর্তিত হচ্ছে--কেউ বলছেন কর্মমুখী শিক্ষা চাই, কেউ বলছেন শিক্ষার প্রয়োজন জীবন গঠনের জন্য। কিন্তু কার্যত: কোনোটাই হচ্ছে না। না হবার কারণ হচ্ছে--নানা মুনির নানা মত। এ দেশীয় বুদ্ধিজীবীরা যে মতাবলম্বীই হোন, মূলত: তারা রামকৃষ্ণ অনুসারী। তাদের আদর্শই হচ্ছে 'যত মত তত পথ'। কোনো মতই এক পথে বা কোন পথই এক মতে এসে মিলছে না। শিক্ষাক্রম তাই বারবার অস্থিরতায় কাঁপছে, আর কাঁপছে দেশের অগণিত শিক্ষার্থী বালক-বালিকার স্বপ্নাচ্ছন্ন নধর হৃৎপিণ্ড।

তাদের এই ক্রন্দন আমাকে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই স্পর্শ করে। আমার ছাত্রজীবনের [illegible]

শেষপ্রান্তে এসে দেখছি--ছাত্র জীবনে বাধ্যতামূলকভাবে যেসব পাঠ গ্রহণ করে শরীর ও মনকে পীড়িত করেছি, তার খুব কম বিষয়ই আমার জীবন ও জীবিকার্জনে কাজে এসেছে। যেটুকু এসেছে, তার ভিত-প্রস্তুতি ছিল নি:সন্দেহে বিদ্যালয়ে, বাকীটা ছিল আমার আত্মলীলার পাঠে। জীবনের দুস্তর পথে চলতে চলতে শিক্ষার দু'টি ধারা সম্পর্কে প্রায়ই আমার মনে প্রশ্ন জেগেছে। একটি জীবনমুখী, আর একটি জীবিকামুখী। দু'টি ধারা কিন্তু পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়, অথচ অবিচ্ছিন্নও বলা চলে না। জীবনের পূর্ণ বিকাশের জন্য যে আত্মপ্রস্তুতি ও জ্ঞান প্রয়োজন, তা পাঠ্য পুস্তকে প্রধানত: খুঁজে পাওয়া কঠিন। কিন্তু কঠিন হলেও পাঠ্য পুস্তকই বিদ্যার্থীর মনে জ্ঞানোন্মেষ ঘটায়। সেই জ্ঞানকে ব্যক্তির বোধ ও রুচির দ্বারা মার্জিত করে, তবে জীবনচর্চায় ব্যবহার করতে হয়। জীবিকামুখী পাঠক্রম স্বতন্ত্র হলেও স্কুল-কলেজের একটা বিশেষ স্তর পর্যন্ত এই উভয় ধারাকে প্রায় একই সঙ্গে চলতে হয়। সেখানে শুধু সার্বিক জ্ঞান আহরণই উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যের সঙ্গে পরবর্তী স্তরে এমন কিছু পাঠক্রম যুক্ত হয় যার মূল লক্ষ্যই থাকে জীবিকার্জনে উপযুক্ত হয়ে ওঠার দিকে। শুধু আমাদের মতো উন্নয়নশীল গরীব দেশে নয়, সব দেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রধানত: এরকমটাই ঘটে থাকে। প্রশ্নটা সেখানে নয়। প্রশ্ন হচ্ছে শিক্ষার সুষম ব্যবস্থা নিয়ে। এই সুষম ব্যবস্থাই পারে শিক্ষার্থীর ওপর পাঠের পাহাড়ী চাপ সৃষ্টি না করে তাকে একই সঙ্গে আত্মজ্ঞান ও কর্মজ্ঞানে ঋদ্ধ করে তুলতে। জীবিকামুখী শিক্ষার পাঠ্যক্রম হবে ততটাই--যতটা জীবিকার ক্ষেত্রগুলোতে আপাত প্রয়োজন। এই আপাত প্রয়োজনের পরে থাকবে বিশেষ বিশেষ বিষয় সম্পর্কে শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতাই শিক্ষার্থীকে তার কঠিনতম বিষয় সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ করে তুলবে। কারণ শিক্ষার ক্রমিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তিরও বিকাশ হতে থাকে। কঠিনতম বিষয়কে উপলব্ধি করা তখন তার পক্ষে সম্ভব। বলা প্রয়োজন যে, জীবন ও জীবিকার উভয় ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর রুচিগত আগ্রহটাই আসলে বড়। আমি কি চাই: শিক্ষার মাধ্যমিক স্তর পেরিয়ে শিক্ষার্থীর কাছে এইটেই বড় প্রশ্ন। জীবনে সে যা হতে চায়, সেই দিকের জ্ঞানের পথেই তাকে অগ্রসর হতে হয়; সঙ্গে সঙ্গে ঘটতে থাকে তার ভাবের বিকাশ। এই ভাবই তাকে মনোরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করে।

কিন্তু যা হতে চাওয়া যায়, তাই যদি হওয়া যেতো, তবে তো জীবনে কোন সমস্যাই থাকতো না। সমস্যাটা সেইখানেই--যেখানে এই হতে চাওয়ার সিঁড়িগুলো সর্বত্র মসৃণ বা সহজগম্য নয়। সেখানে শিক্ষার্থীর স্বীয় নির্বাচনে ভ্রম ঘটে। এই ভ্রম অভিভাবক মহলেও [illegible] ছেলেকে সা[illegible]

বা হিউমেনিটিজ দেয়া হলে [illegible] দেখা গেল--ছেলে ভালো: [illegible] হয়ে বেরিয়েছে। সুতরাং শিক্ষার্থীর মানসিক প্রবণতাকে সর্বাগ্রে [illegible] দরকার। এটা শিক্ষার্থীর নিজের সম্পর্কেও এবং অভিভাবকের পক্ষেও। না বুঝে কোনো বিষয়কে অধীত বিষয় করে নেয়াও যা, না বুঝে কোনো বিষয়কে শিক্ষার্থীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়াও তা। জ্ঞানের নাড়ী ঋজু না হলে সমস্ত পাঠ্যই তার কাছে ভারী বলে বিবেচিত হবে। সৃষ্টি ক্ষেত্রে মোট বইতে পারে দু' শ্রেণীর জীব: একটি গাধা এবং অপরটি রামায়ণের হনুমান। গাধার পিঠে কয়েক মণ কাপড়ের গাঁট চাপিয়ে দিলেও সে পদসঞ্চারে সক্ষম, তেমনি গন্ধমাদন পর্বত স্কন্ধে ধারণ করেও রামায়ণের হনুমান ক্লান্তিহীন। এই দু'টি জীবের মতো যদি বিশ্বসংসারের বিদ্যার্থীরা অত্যধিক বিদ্যার বোঝা বইবার শক্তি পেতো, তবে, কবেই সমাজপতিদের ভারী মাথা হাল্কা হয়ে পিতৃ-পিতামহদের বুকের শক্তিশেল অতি সহজেই নিরাময় হতো।

ইদানীং আমাদের দেশে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সর্ববিষয়ের পাঠ নির্ধারণ করে শিক্ষা-পরিচালকরা পরবর্তী স্তরে শিক্ষার্থীর, মেধাগত পাঠ্য নির্বাচনের সুযোগ সৃষ্টি করছেন। মেধা ও রুচি দু'টি স্বতন্ত্র বিষয়। এই দু'টি যেখানে মেলে, সেখানে কোনো প্রশ্ন নেই, কিন্তু যেখানে মেলে না, সেইখানেই প্রশ্নটা বড় করে দেখা দেয়। যেমন সাধ্য ও সাধ। আমার রসগোল্লা খেতে সাধ, কিন্তু ক্রয়োপযোগী আর্থিক ক্ষমতা বা সাধ্য নেই। মেধা ও রুচিকে মিলিয়েই তবে সকল শিক্ষার সার্থকতা। কি জীবনমুখী, কি জীবিকামুখী। তার জন্যে পাঠ্যক্রমকেও যেমন সীমিত ও সহজ করা দরকার, তেমনি পরীক্ষা নামক যাদুক্রীড়ায় যাদুকরের হাতের যষ্টিকে যষ্টিমধুর মতো স্বাদু করা প্রয়োজন।

আসলে নিউক্লিয়ার তেজস্ক্রিয়ার মতো সাধারণ পাঠ্য তালিকাও দিনে দিনে জটিল হয়ে বিদ্যার্থীর মগজে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করছে। তার মস্তিষ্কের টিস্যুগুলোতে এমন কিছু ললিতধর্মী সৌকুমার্যের তরঙ্গ থাকছে না যার মধুর নিক্কনের অবকাশে কোনো জটিল বিষয়কে সে সহজে সেখানে প্রবেশ করাতে পারে। আসলে জীবন গঠনের প্রারম্ভে কোনো বিদ্যার্থীর বোধের সামনে যদি মহৎ আদর্শবাদ ও বৃহৎ হৃদয়ধর্মিতা কিছু না থাকে [illegible] তার গঠনটাই হয় নিরেট।

যেমন কুমোরের তৈরী প্রতিমা। তাতে মাটির পলেস্তারার আগে চাই বাঁশ ও খড়ের শক্ত বুনোট, এই বুনোটটাই প্রতিমাকে কাঠামোয় দৃঢ় করে ধরে রাখে, আর প্রতিমা নির্মিত হবার পর তাতে লাবণ্য দান করে গর্জন তেল। যে প্রতিমার পিছনে শক্ত বুনোট আর অঙ্গ জুড়ে গর্জন তেলের প্রলেপ নেই, তার যা দৃশ্যমান অবস্থা, সেই অবস্থার সঙ্গে বিন্দুমাত্র পার্থক্য নেই কোনো বিদ্যার্থীর। বিদ্যাভবনের পরিবেশ তার উপর জোর করে পাঠ্যক্রম চাপিয়ে অবশ্যই তাকে যোগ্য শিক্ষিত করে তুলতে হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু তা করতে গিয়ে তাকে যদি গাধা বা রামায়ণের হনুমান মনে করা যায়, তবে ভুল হবে, শুধু ভুল নয়, তাকে জাতীয় অপরাধ বলতে হবে শিক্ষার্থীর মনের জানালাগুলোকে খুলে দিতে হবে। তার মনকে বুঝতে হবে, তার মনের বিকাশ ঘটাতে হবে, তাকে হৃদয়ধর্মী ও আদর্শবাদী করে তুলতে হবে, অর্থাৎ একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে উঠতে যা যা প্রয়োজন, তাকে তার সবটাই দিতে হবে। নইলে তাকে দেয়া শিক্ষা আদৌ শিক্ষা বলে গণ্য হবে না। আগে আত্মগঠন, পরে জীবিকার উপযোগী পাঠ। এই গঠনে-পঠনে মিলেই একটি বালক-বিদ্যার্থী একদিন দেশ ও জাতির অধিনায়ক হয়ে ওঠে।

নিজের উদাহরণ টেনে আমার এই বক্তব্যের গোড়ায় যে কথার সূত্রপাত করেছিলাম, এতক্ষণের আলোচনার পর সেই কথা কেউ যদি আমার শেষ কথা বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, তাহলে বোধ করি কোনো দুর্ধর্ষ শিক্ষাবিদের তার্কিক বিচারে আমাকে একটি কলমের খোঁচাতেই অপরাধীর কাঠগড়ায় নিয়ে হাজির করা হবে না। তার আগে একটিবার অন্তত: তিনি ভেবে দেখবেন-এই লোকটা যত বড় মূর্খই হোক না কেন, এর উক্তিগুলো নিতান্তই উন্মাদের প্রলাপোক্তি নয়, তার মধ্যে কিছু একটা চিন্তার অবয়ব খুঁজে পাওয়া যায়--যা নিয়ে অস্ত্রোপচারের টেবিলে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কিছুক্ষণ অন্তত: গবেষণা চলতে পারে।